সংলাপ ও সমঝোতা আজ জরুরি

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১০ জানুয়ারি ২০১৫)

বর্তমান সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণার কারণে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সহিংসতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতায় নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী ও লক্ষীপুরে ৯ জন নিহত হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বুধবার দিবাগত রাতে রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে ফেলার কারণে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ৫০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। একই কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল জয়পুরহাটেও। ৪ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে মানুষ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। জরুরি প্রয়োজনেও তারা যেতে পারছে না এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায়। এ অসহনীয় অবস্থা ৫ জানুয়ারি ২০১৪-এর পূর্ববর্তী সহিংসতাপূর্ণ পরিস্থিতির কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে বিচারপতিদের ওপর হামলা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত উস্কানিমূলক ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, তাদের ঘর-বাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্যও হামলার শিকার হচ্ছে। আমাদের প্রধান দুটি দল যেন একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার এক অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা নাগরিকরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা শঙ্কিত সামনের দিনগুলোর কথা ভেবেও, কারণ এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা একটি অকার্যকর রাষ্ট্র, এমনকি গৃহযুদ্ধের দিকেও ধাবিত হতে পারি।

আমরা সহিংসতা ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। একইসঙ্গে দাবি জানাই অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করার। আমরা আরও দাবি জানাই, যারাই সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদেরকে যেন দল-মত নির্বিশেষে খুঁজে বের করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হয়।

আপনারা সকলেই অবগত যে, গত ৫ জানুয়ারি ২০১৫ বিএনপি ও তার মিত্ররা 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে পালন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার ঘোষণা দেয়। তার বিপরীতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা একই দিনে 'গণতন্ত্রের বিজয় দিবস' হিসেবে পালন করার উদ্যোগ নেয়। সরকারের পক্ষ থেকে বিএনপিকে সমাবেশ করার অনুমতি না দিয়ে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজধানী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে বিএনপি চেয়ারপার্সনকে তাঁর গুলশানের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে, বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন এবং কার্যালয়ের চারপাশে ইট ও বালুর ট্রাক দিয়ে ৩ জানুয়ারি থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সারাদেশ থেকে যাতে বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলোর নেতাকর্মীরা ঢাকায় আসতে না পারে সেজন্য এক ধরনের অঘোষিত অবরোধও আরোপ করা হয়। অবরোধের কথা অস্বীকার করে সরকারের একজন মন্ত্রী দাবি করেন যে, বেগম জিয়া নিজে তাঁর কার্যালয় সংস্কারের জন্য ইট ও বালুভর্তি ট্রাক এনে রেখেছেন। আরেকজন মন্ত্রী দাবি করেন, বেগম জিয়ার নিরাপত্তার জন্যই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেগম জিয়া অবরুদ্ধ নন এবং তিনি ইচ্ছে করলেই কার্যালয় ত্যাগ করতে পারেন – মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪ জানুয়ারির এ ঘোষণা সত্ত্বেও এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ৫ জানুয়ারি তাঁর কার্যালয় থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে তিনি সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ঘোষণা দেন, যে অবরোধ এখনো চলছে। এমনকি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষেও অবরোধ শিথিল করা হয়নি। টানা অবরোধের কারণে জনজীবনে এরইমধ্যে নেমে এসেছে চরম অস্বস্তি। এ অবস্থা চলতে থাকলে অর্থনীতিতেও স্থবিরতা দেখা দেবে।

এটি সুস্পষ্ট যে, বিএনপি ও তার মিত্রদেরকে ৫ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকায় সমাবেশ করতে না দিয়ে – যদিও এর কয়েকদিন আগেই জাতীয় পার্টিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয় – রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর অহেতুক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণ সংবিধান স্বীকৃত সভা-সমাবেশ করার মৌলিক অধিকারের নগ্ন লঙ্ঘন। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বিএনপি চেয়ারপার্সনকে তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হলে তা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের এ সকল কার্যক্রম আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধঃপতনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে, যা আমাদেরকে চরমভাবে উৎকণ্ঠিত করে। কারণ এমন অধঃপতন আমাদেরকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে মহাজোট ভূমিধ্বস বিজয় নিয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে।

তবে একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্রমঅধঃপতন বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে। আহসান উল্লাহ মাস্টার, শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা এবং ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়া যার ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত। ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা যার সবচেয়ে নগ্নতম দৃষ্টান্ত। একটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পৃথিবীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে এধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবসান হওয়া জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের।

গত কয়েক বছরে আমরা জাতি হিসেবে মোটাদাগে দুটি বড় ইস্যুর সম্মুখীন হয়েছি। এর একটি হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়টি হলো নির্বাচন নিয়ে বিরোধ। যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন থাকার কারণে, স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সহিংসতার মুখেও, সরকার এ বিচার কাজ চালিয়ে নিতে পারছে, যদিও বিচার কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন না করার কারণে জনমনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদেরকে ভোট না দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করি। এছাড়া নির্বাচনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকেও আমরা অন্তত একজন যুদ্ধাপরাধীর নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য শুরু করার তাগিদ দেই।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। আমাদের স্বাধীনতাও ঘোষিত হয়েছিল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর গণতন্ত্র হলো জনগণের সম্মতির শাসন। গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ীও আমরা 'জেনুইন' বা সঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়বদ্ধ। তা সত্ত্বেও, সুজন ও নাগরিক সমাজের আরও অনেকের বিরোধিতা উপেক্ষা করে, ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে একটি একতরফা ও ভোটারবিহীন নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়, যে নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের পরিবর্তে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য 'নির্বাচিত' হয়েছেন। এ নির্বাচনে ৪১টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে মাত্র ১২টি দল অংশ নিয়েছে। উল্লেখ্য, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একটি রায়ে বলা হয়েছে যে, বিকৃত ও ভোটারবিহীন নির্বাচন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে [*এএফএম শাহ আলম বনাম মজিবুর রহমান*, ৪১ ডিএলআর (এডি) ১৯৮৯]।

সংবিধান রক্ষার নামে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও, সংবিধান লঙ্ঘন এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করেই ভোটারবিহীন বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে তারা বল প্রয়োগ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করছে এবং রমরমা গ্রেফতার বাণিজ্য চলার অভিযোগ উঠছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশ একটি চরম কর্তৃত্ববাদী পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। আর কর্তৃত্ববাদই উগ্রবাদের জনক। তাই নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে গভীরভাবে শঙ্কিত।

আমরা মনে করি যে, ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে এক অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর ও সম্ভাব্য অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিগত কয়েক দিনের হানাহানি ও সংঘাত এ অস্থিতিশীলতারই বাস্তব প্রতিফলন। এ সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি। তা না হলে আমরা এক চরম সংঘাতময় অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে একটি নির্বাচন, এমনকি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা মনে করি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এড়াতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সংলাপে বসা ও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতায় আসা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সংলাপ ও সমঝোতায় পৌঁছানোও আজ জরুরি। এর মাধ্যমে আমাদের জন্য বহু প্রত্যাশিত জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পথ সুগম হবে, যা বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করবে।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে সংলাপে বসার জন্য আমরা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেই প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে হবে বলে আমরা মনে করি। তবে অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদেরও সম্পৃক্ত করা জরুরি। কিন্তু আমরা অতীতের ন্যায় 'সংলাপ-সংলাপ খেলা' দেখতে চাই না। আমরা চাই আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা ও টেকসই সমাধান।

সংলাপ ও সমাস্যার সমাধানের জন্য শুধু সম্মিলিত প্রয়াসই নয়, এর জন্য আরো প্রয়োজন হবে একটি সুনির্দিষ্ট এজেন্ডার। গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ সুজন-এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উত্থাপিত ও অনুমোদিত খসড়া 'জাতীয় সনদ'টি প্রাথমিক এজেন্ডা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা আশা করি, আমাদের সম্মানিত রাজনীতিবিদগণ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

আমরা অতীতেও রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছি এবং এর থেকে সমঝোতার মাধ্যমে উত্তরণও সম্ভব হয়েছিল। নব্বইয়ের 'তিনজোটের রূপরেখা' যার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আর তা সম্ভব হয়েছে নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা ও শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আমরা আশা করি যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিরাজমান সংকটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হবেন এবং একটি জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করবেন। একইসঙ্গে তাঁরা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থানের ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবেন।

আর আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে না আসেন, তাহলে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে একটি অর্থবহ সংলাপের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো। মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান – তিনি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি। তাই আমরা মনে করি যে, তাঁর 'সুপিরিয়র রেস্পন্সিবিলিটি' বা আরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত ল্যাটিন উক্তির প্রতি তাঁর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেগুলো যুগে যুগে বিচারকদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে: 'Quod alias non est licitum, necessitas licitum facit' [That which otherwise is not lawful, necessity makes lawful (যা আইনসিদ্ধ নয়, প্রয়োজনে তা আইনসিদ্ধ হয়)], 'salus populi suprema lex' [safety of the people is the supreme law (জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন)] and 'salus republicae est suprema lex' [safety of the State is the Supreme law (রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন)]. আশা করি, প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যথাযথ প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার পরিচয় দেবেন।